মিত্রোখিন রহস্য – ৩

ভাসিলি মিত্রোখিন। কেজিবির এই কর্মকর্তা অতি গোপনীয় ও সংবেদনশীল নথিপত্র নকল করে তার গ্রামের বাড়িতে ঘরের মেঝের নিচে লুকিয়ে রাখতেন। এতে ঠাঁই পেয়েছে ষাট, সত্তর ও আশির দশকের বাংলাদেশের রাজনীতির কিছু ঘটনাপ্রবাহ। সম্প্রতি প্রকাশিত মিত্রোখিন আর্কাইভ অবলম্বনে লিখেছেন

মিজানুর রহমান খান

মোশতাক ও তোয়াবকে নিয়ে কেজিবির কৌশল

খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও জিয়াউর রহমান কর্তৃক অপসারিত এয়ার ভাইস মার্শাল মুহাম্মদ গোলাম তোয়াবের 'চরম প্রতিক্রিয়াশীল' চরিত্র ও ভূমিকা অনেকেরই জানা। কিন্তু একেই কাজে লাগিয়ে কেজিবির ফায়দা হাসিলের দুটি চমকপ্রদ চেষ্টা বর্ণিত হয়েছে মিত্রোখিন আর্কাইভে।

রিগ্যান প্রশাসন মোশতাককে দিয়ে জিয়ার সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং তোয়াব একজন সিআইএ এজেন্ট ১৯৭৯ সালে এমন দুটো 'সাজানো কাহিনী' জিয়া প্রশাসনে রটিয়েছিল কেজিবি। তবে ক্রিস্টোফার এন্ড্রু ও মিত্রোখিন তোয়াব চরিত্র চিত্রণে তার প্রতিক্রিয়াশীল দিকটি একেবারেই বিবেচনায় নেননি বলে প্রতীয়মান হয়। তার সম্পর্কে যেভাবে শুধু 'অপপ্রচার' তত্ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে তা বিচ্ছিন্নভাবে পড়লে মনে হতে পারে তোয়াব ধোয়া তুলসি পাতা ছিলেন।

'সংবিধানে শুধু বিসমিল্লাহ' কথাটির সংযোজনে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। এ ধরনের বিষয় নিয়েই জিয়ার সঙ্গে তার মনোমালিন্য ঘটে—এ প্রতিবেদকের প্রশ্নের জবাবে ওই মন্তব্য করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ। তার কথায়, 'কেজিবি হয়তো বাড়িয়ে বলেছে, কিন্তু কিছু সত্যতার কথা আমাদের অনেকেরই জানা।' সিপিবির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক বলেন, 'তোয়াবকে আমরা সব সময় প্রতিক্রিয়াশীল এবং আমেরিকাপন্থি হিসেবেই মনে করতাম।'

অবশ্য মিত্রোখিন আর্কাইভেও স্বীকার করা হয়েছে যে, 'প্রেসিডেন্ট জিয়ার সরকারবিরোধী শক্তির কতিপয় প্রকৃত চক্রান্তের ঘটনাকে কেজিবি সুকৌশলে তার গল্প তৈরিতে ব্যবহার করে। জিয়ার সাড়ে পাঁচ বছরের জামানায় তাকে অন্তত ১৭টি বিদ্রোহ ও ক্যু প্রচেষ্টা মোকাবিলা করতে হয়। ১৯৭৯ সালের আগস্টে ঢাকায় একদল কর্মকর্তা গ্রেপ্তার হন। তাদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টকে উৎখাতের চক্রান্তে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়।' *(মিত্রোখিন, পেঙ্গুইন গ্রুপ, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৫৪)*

এ ঘটনার দুই মাস পরে ইউরি আন্দ্রপভ 'ডিজাইন ফরমেশন ও কভার্ট অপারেশন' সেল সার্ভিসে এর জন্য একটি এফসিডি *[ফার্স্ট চিফ (ফরেন ইন্টেলিজেন্স) ডাইরেক্টরেট]* প্রস্তাব অনুমোদন করেন। আন্দ্রপভ ১৯৬৭-৮২ পর্যন্ত কেজিবি চেয়ারম্যান ছিলেন। পরে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন। ওই প্রস্তাবের বিষয়বস্তু ছিল অপসারিত এয়ার ভাইস মার্শাল মুহাম্মদ গোলাম তোয়াব জিয়াবিরোধী চক্রান্তকারীদের সমর্থন দিচ্ছেন মর্মে একটি বানোয়াট চিঠি তৈরি।

মিত্রোখিন লিখেছেন, 'ওই নীলনকশার আওতায় বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কার সংবাদপত্রে এমন রটনা প্রচার করা হয় যে, তোয়াব ছিলেন একজন দীর্ঘকালীন সিআইএ এজেন্ট।' কেজিবির নথি অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে ১০টি ভারতীয় সংবাদপত্র 'পেরোলে' ও একটি সংবাদ সংস্থা কেজিবির 'নিয়ন্ত্রণে' ছিল। ভারতে ১৯৭২ সালে ৩ হাজার ৭৮৯ নিবন্ধ, ১৯৭৩ সালে ২ হাজার ৭৬০ *(এবং ২৮টি বই ও প্যামফ্লেট)*, ১৯৭৪ সালে ৪ হাজার ৪৪৬ ও ১৯৭৫ সালে সর্বোচ্চ ৫ হাজার ৫১০টি নিবন্ধ কেজিবির আনুকূল্যে ছাপা হয়। এন্ড্রু লিখেছেন, মিত্রোখিন প্রতিটি পত্রিকা চিহ্নিত করেছেন। ১৯৭৬ সালের এক নথিতে দুটি দৈনিক, আটটি সাপ্তাহিক, চারটি সাময়িকীর নাম রয়েছে। তবে আইনগত কারণে এসব পত্রিকার নাম চিহ্নিত করা হলো না। *(মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-৩২৪ ও ৫৬৩-৪)*

১৯৭৬ সালে সিপিবির একটি লিফলেটে তোয়াব সম্পর্কে মূল্যায়ন ছিল এ রকম: ১৫ আগস্ট ও ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে এম জি তোয়াব উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও বিমানবাহিনীর প্রধান হিসেবে আবির্ভূত হন। তার বিরুদ্ধে 'বৈদেশিক মুদ্রায় পৌনে ২ লাখ টাকা, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অকেজো বোয়িং ক্রয়ের টাকা ও ট্যাঙ্কার কেনার নামে দেড় কোটি টাকা আত্মসাৎ, আবুধাবি থেকে অপরিশোধিত তেল সরবরাহের জন্য জাহাজ লাইনের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের সুবাদে ১০ লাখ ডলার বিদেশী ব্যাংকে জমা, ব্যাংককের বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে ১০ হাজার ডলার ও লন্ডন দূতাবাস থেকে ২ হাজার পাউন্ড তছরুপের অভিযোগ ওঠে।' এই লিফলেট মতে ফারুক ব্যাংককে বলেন, তোয়াব চেয়েছিলেন বাংলাদেশকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে। তোয়াব একজন পশ্চিম জার্মান নাগরিক। ২৫ জুন ১৯৭৬ *ফারইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ* বলেছে, বাংলাদেশে কূটনৈতিক পার্টিগুলোতে চলতি একটি সরস উক্তি হলো, 'আমরা জানতামই না যে, আমাদের সরকারের এক-তৃতীয়াংশ আসলে পশ্চিম জার্মান।' 'দেশের শত্রু কারা, তোয়াব গংয়ের কেচ্ছা' শীর্ষক সিপিবির এক বুলেটিনে তথ্য দেওয়া হয়, তোয়াব পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের কনফেডারেশন

গঠনে গোপনে চুক্তিবদ্ধ হন। তারই পুরস্কারস্বরূপ তাকে দুই স্কোয়াড্রন মিগ বিমান ও দুটি রেজিমেন্টের প্রয়োজনে দুটি কামান দেওয়ার কথা। লিবিয়ায় দুইবার সফরকালে বাংলাদেশকে ইসলামি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। এর প্রতিদানে লিবিয়া এক স্কোয়াড্রন মিগ দিতে চেয়েছিল। তোয়াব এক গোপন সফরে চীনেও যান। সেখানেও সাহায্যের আশ্বাস মেলে। তোয়াবের নেতৃত্বে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সিরাত সম্মেলন থেকে বাংলাদেশের পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত ও দেশের নাম পাল্টানোর দাবি ওঠে।

তোয়াব ১৯৭৫ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে ১৯৭৬ সালের ৩০ এপ্রিল বিমানবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৮ অক্টোবর ১৯৭৫ দৈনিক বাংলার এক রিপোর্টে দেশরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তির বরাতে তথ্য দেওয়া হয়, '১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য তিনি 'সিতারা-ই-নুরাত' খেতাবে ভূষিত হন। একাত্তরে যুদ্ধের আগে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের একটি বিমান ঘাঁটির অধিনায়ক ছিলেন। বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে '৭১-এর ২ এপ্রিল পাকিস্তান বিমানবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে সপরিবারে পশ্চিম ইউরোপে চলে যান।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের *'নিউ সলিডারিটি'* পত্রিকার ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ সংখ্যায় 'বাংলাদেশের সিআইএ এজেন্ট' শীর্ষক এক রিপোর্টে তোয়াব সম্পর্কে বলা হয়, বাংলাদেশে সামরিক বাহিনী ও সরকারে সিআইএর যেসব এজেন্ট বসানো হয়, তাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হলেন তোয়াব। তোয়াব ছিলেন ন্যাটোতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা, যিনি পশ্চিম জার্মানি ও অন্যান্য দেশে ন্যাটো কমান্ডের অধীনে কাজ করেন। '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ না দিয়ে পশ্চিম জার্মানিতে চলে যান এবং বিগত তিন বছরের অধিকাংশ সময় সেখানেই থাকেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তোয়াব বহুবার বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীতে ঢোকার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তারা এবং রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান তাকে গ্রহণ করতে রাজি হননি। *(সূত্র: সিপিবির বুলেটিন)* তবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় যে, তোয়াব ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে বাংলাদেশ বাহিনীর চিফ অব স্টাফ (অপারেশন) রূপেও কাজ করেন।

প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা অজয় রায় বলেন, 'আমার স্পষ্ট মনে আছে, তোয়াব নিহত রাজাকারদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের দাবি জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন।'

রিগ্যানের ষড়যন্ত্র

মিত্রোখিন আর্কাইভ মতে ১৯৮১ সালে আরেক গল্প প্রচার করা হয় এই উদ্দেশ্যে যে, রিগ্যান প্রশাসন জিয়ার সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সে কারণে তারা খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ স্থাপন করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান এই প্রতিবেদককে বলেন, জিয়ার সঙ্গে মোশতাকের সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল না। কারণ তারা দুজনই মনে করতেন তাদের রাজনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে ক্যান্টনমেন্ট।

মোশতাক প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিয়ে মস্কো ঘেঁষা ন্যাপ নেতা মহিউদ্দিন আহমদকে '৭৫ সালের সেপ্টেম্বরে তার বিশেষ দূত হিসেবে মস্কো পাঠান। কিন্তু তার এ সফরে বরফ গলেনি।

মিত্রোখিন আর্কাইভে বলা হয়, 'মুজিব হত্যার পর সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য মোশতাক প্রেসিডেন্ট হন। জিয়া তাকে ১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কারাবন্দি রাখেন। ১৯৭৯ সালের নির্বাচন মোটামুটি অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি ৩০০ আসনের মধ্যে ২০৭টিতে জয়ী হয়। জিয়া অবশ্য সশস্ত্রবাহিনীর অসন্তোষ কখনোই পুরোপুরি দমাতে পারেননি। অল্পের জন্য কয়েকটি হত্যা প্রচেষ্টা থেকে বেঁচে গেলেও ১৯৮১ সালের ২৯ মে (প্রকৃতপক্ষে ৩০ মে) চট্টগ্রাম সফরকালে স্থানীয় সেনা অধিনায়কের নেতৃত্বাধীন এক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন।' *(মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-৩৫৪)*

মিজানুর রহমান খান : সাংবাদিক।

চতুর্থ কিস্তি : 'পাকিস্তানের ভাঙন ছিল কেজিবির দর্শন'

[The Mitrokhin's version on CIA's involvement should be read with a grain of salt. Please read Lawrence Lifschultz's paper "CIA Involvement in Sheikh Mujib's Killing" in this connection.

http://www.thedailystar.net/2005/08/16/d5081601033.htm

http://launch.groups.yahoo.com/group/vinnomot/message/4350

http://www.mukto-mona.com/Articles/editorial/english/mujib_killing_CIA.htm